মুক্তিযুদ্ধের স্থানীয় ইতিহাস চর্চা **

আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন *

সার–সংক্ষেপঃ *জাতীয় ইতিহাস প্রণয়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় ইতিহাসের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ স্থানীয় ইতিহাসের বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটে জাতীয় ইতিহাসে। তাই স্থানীয় ইতিহাসকে দেশের সার্বিক ইতিহাস চেতনার ভিত্তি বলা হয়ে থাকে। ইদানীং মুক্তিযুদ্ধের লেখালেখির ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধকে প্রাধান্য দেয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ (১) মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিশেষ করে স্থানীয় ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে যে সকল উদ্যোগ নেয়া হয়েছে সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা; (২) মুক্তিযুদ্ধের স্থানীয় ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর প্রকৃতি ও বিষয়বস্তু মূল্যায়ন; ও (৩) মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার সম্ভাবনাময় দিক তুলে ধরা এবং স্থানীয় তথা জাতীয় ইতিহাস রচনার একটি রূপরেখা প্রণয়ন করা।*

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে প্রথম উদ্যোগ নেয় ১৯৭৩ সালে বাংলা একাডেমীর "জাতীয় স্বাধীনতা ইতিহাস রচনা পরিষদ"। সবচে বড় ধরনের উদ্যোগ হচ্ছে তথ্য মন্ত্রণালয়ের "বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্প।" মুক্তিযুদ্ধের স্থানীয় ইতিহাসের বইগুলোকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছেঃ (১) মুক্তিযুদ্ধের স্থানীয় ইতিহাস রচনার প্রয়াস বা মূল্যায়ন; (২) রণাঙ্গন বা সশস্ত্র সংগ্রাম; (৩) অবরুদ্ধ অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধ; (৪) মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশ; (৫) দলিলপত্র ও আলোকচিত্র। এসকল শিরোনামভুক্ত প্রায় ১০০ টি বই নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। এ বইগুলো সম্পর্কে চূড়ান্ত মূল্যায়ন হচ্ছে ইতিহাস তত্ত্বের দিক থেকে এ গুলোকে ইতিহাস না বলে ইতিহাসের উপকরণ বলাই শ্রেয়। তাই মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার জন্যে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ নেয়া উচিৎ। এরশাদ সরকারের আমলে ''বাংলাদেশ ইতিহাস গবেষণা সংস্থা'' গঠনের জন্য যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল তা সংশোধিত ও পরিবর্ধিত আকারে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্পের সংগৃহীত দলিলপত্রকে কেন্দ্র করে এই স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা গঠিত হতে পারে। তথ্য বিকৃতিমুক্ত ও নিরপেক্ষ এমনি একটি পূর্ণাঙ্গ ও বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনা হবে এ সংস্থার মুখ্য কাজ।

---

* প্রভাষক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

** এই প্রবন্ধ রচনায় ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক এবং আমার সহকর্মী প্রফেসর কে, এম, মোহসীন, প্রফেসর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, প্রফেসর মুনতাসীর মামুন, ডঃ রতন লাল চক্রবর্তী এবং বিলুপ্ত স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্পের গবেষণা অফিসার ওয়াহিদুল হক (বর্তমানে জাতীয় যাদুঘরের গ্রন্থাগারিক) উপদেশ ও তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

এক

যে কোনো দেশের স্থানীয় ইতিহাস আপন বৈশিষ্ট্য মন্ডিত, কিন্তু এর প্রতিফলন ঘটে জাতীয় ইতিহাসে। তাই স্থানীয় ইতিহাসকে দেশের সার্বিক ইতিহাস চেতনার ভিত্তি বলা হয়ে থাকে। বর্তমানে ঐতিহাসিক ও গবেষকগণ অনুভব করেছেন কোন দেশ ও সমাজের সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখার আগে সে দেশ ও সমাজের স্থানীয় ইতিহাসকে উৎঘাটন করতে হবে, যার উপর ভিত্তি করে রচিত হবে জাতীয় ইতিহাস। বস্তুত স্থানীয় ইতিহাস রচনার মাধ্যমেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে রচিত হতে পারে একটি জাতির পূর্ণাঙ্গ ও বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস।

স্থানীয় ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলাদেশে স্থানীয় ইতিহাস চর্চা শুরু হয়। ইদানীং স্বাধীনতা/মুক্তিযুদ্ধের ওপর লেখালেখির ক্ষেত্রেও স্থানীয় অবদানের বিষয় কিছুটা গুরুত্ব পাচ্ছে। বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপিত হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ চর্চা কেন্দ্র। বিগত দু'বছর ধরে একুশের অনুষ্ঠান, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবসে স্থানীয় ভিত্তিতে বিভিন্ন কর্মসূচী, মুক্তিযুদ্ধের আলোকচিত্র প্রদর্শনী, স্মৃতিচারণসহ বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের স্থানীয় অবদান, রণাঙ্গনের বর্ণনামূলক কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে। এযাবৎ মুক্তিযুদ্ধের ওপর দেশ–বিদেশে প্রায় ১২০০ বই প্রকাশিত হয়েছে। "বাংলাদেশঃ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জী" বইয়ে ৮৮৯টি মুক্তিযুদ্ধের বইয়ের তালিকা ও উল্লেখযোগ্য বইয়ের আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে।[১] স্থানীয় পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানা যায় প্রায় ১২০/১২৫টি বই থেকে। প্রকাশিত বইগুলোর সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলা যায়, বেশীর ভাগ বইই বর্ণনামূলক এবং স্মৃতিচারণমুলক। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বইগুলোতে বিশ্লেষণ অনুপস্থিত। মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠন, প্রবাসী সরকার কিংবা প্রবাসে যারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জড়িত ছিলেন তাঁরা অনেকে স্মৃতি তুলে ধরেছেন গ্রন্থাকারে। তাই গ্রন্থগুলো থেকে সমকালীন রাজনীতি, যুদ্ধের অবস্থা, সাংগঠনিক তৎপরতা, যোদ্ধাদের অবদান জানা যায়। যদিও ইতিহাস তত্ত্বের বিচারে বইগুলোকে ইতিহাস না বলে ইতিহাসের উপাদান বলাই শ্রেয়। তাই মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ও বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনা এবং এ উদ্দেশ্যে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত জরুরী। বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ প্রথমত, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিশেষ করে স্থানীয় ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা; দ্বিতীয়ত, মুক্তিযুদ্ধের স্থানীয় ভূমিকার ওপর আলোকপাত করে যে সকল বই প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোর প্রকৃতি ও বিষয়বস্তু মূল্যায়ন এবং তৃতীয়ত, মুক্তিযুদ্ধের ইতহাস রচনার একটি রূপরেখা প্রনয়ন করা।

দুই

স্বাধীনতার বিশ বছরে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার জন্য যে সকল উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়ঃ ১. প্রাতিষ্ঠানিক; ২. ব্যক্তিগত। যে সকল উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তাতে স্থানীয় পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ কতোটা প্রাধান্য পেয়েছে সেই বিষয় সংক্ষেপে আলোচনার চেষ্টা করা হবে। প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করে বাংলা একাডেমী। ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে গঠিত হয় 'জাতীয় স্বাধীনতা ইতিহাস রচনা পরিষদ'। এক বছর মেয়াদী পরিষদ ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যে পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করেছে তা হচ্ছেঃ (১) মুক্তিযুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সাক্ষাৎকার মোট ৪১৪১টি; (২) মুক্তিযুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সশস্ত্র বাহিনীর সৈনিক ও অফিসারের সাক্ষাৎকার ৩৫০টি; (৩) নির্বাচিত গণপ্রতিনিধি, মন্ত্রী পরিষদ সদস্য, বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও স্বাধীন বাংলা বেতার কর্মীর সাক্ষাৎকার ৪৯৫টি; (৪) মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত আলোকচিত্র ৫১১টি এবং (৫) ১৯৪৮ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত বহু জাতীয় দৈনিক পত্রিকা। 'জাতীয় স্বাধীনতা ইতিহাস রচনা পরিষদ' মোটামুটি স্থানীয় পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের উপকরণ সংগ্রহের উপর গুরুত্বারোপ করে। পরবর্তীকালে এ পরিষদের দলিলপত্র বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্পকে দেয়া হয়। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যুদ্ধকালীন রিপোর্ট, অপারেশন অর্ডার, বিভিন্ন যুদ্ধের তথ্য ও সৈনিকদের সাক্ষাৎকারের ওপর ভিত্তি করে ৩০ খন্ডে একটি ইতিহাস প্রণয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করে, যদিও বাংলা একাডেমীর প্রকল্পের মতো এই উদ্যোগটি ফলপ্রসূ হয়নি। পরবর্তী সময়ে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রণয়ন, তাঁদের জীবন বৃত্তান্ত, বয়স, পেশা, শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদি সংগ্রহের চেষ্টা করে। ১৮,০০০ সৈনিক মুক্তিযোদ্ধা, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেসামরিক ৬১,৫৬২ জন মুক্তিযোদ্ধার ওপর তাদের এ কাজ সীমাবদ্ধ। এ উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ শিবিরের প্রামাণ্য দলিল সংগ্রহ করা হয় এবং ২০৮টি খন্ডে তা সংরক্ষিত করা হয়। ময়মনসিংহ জেলা ট্রাস্ট ও ডানকান বাংলাদেশের উদ্যোগে সে সব দলিলের মধ্যে ২৬০৬টি দলিল প্রকাশ করা হয়েছে।[২] ১৯৯১ সালে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের সহযোগিতায় ৫০০ শহীদের জীবন চরিত নিয়ে ''যাদের রক্তে মুক্ত এদেশ" গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এ উদ্যোগ অব্যাহত থাকলে, স্থানীয় পর্যায়ে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকা সম্পর্কে বহু তথ্য জানা যাবে। ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত ''মুক্তিযুদ্ধ ও রাইফেলস" বাংলাদেশ রাইফেলসের ইতিহাস প্রকল্পের একটি প্রকাশনা। ৫৪২ পৃষ্ঠার এ বইয়ে মুক্তিযুদ্ধে রাইফেলসের ভূমিকা, রণাংগনে রাইফেলস সৈনিকদের অবদান, রাইফেলস শহীদদের ৭৬৯ জনের তালিকা রয়েছে। ৩৪ জন অফিসার ও ১২২৬ জন সৈনিক/কর্মচারীর সাক্ষৎকারও এতে রয়েছে। এই বইটি থেকেও স্থানীয় পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গন সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। যদিও বইটি তদানিন্তন সরকার নিষিদ্ধ করে এবং এখনো বইটি নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত।

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বি আই ডি এস) ''মুক্তিযুদ্ধের আর্থ–সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত" শীর্ষক কাজ হাতে নিয়েছে। এর প্রকল্প সমন্বয়কারী ডঃ আতিউর রহমান। তিন বছর মেয়াদী এ প্রকল্প শেষ হবে ১৯৯৩ সালে এবং গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে ১০ খন্ডে ''মুক্তিযুদ্ধের আর্থ–সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত" প্রকাশিত হবে। প্রকল্প সমন্বয়কারীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে জানা যায় এতে মুক্তিযুদ্ধের স্থানীয় অবদান বিশেষ করে কৃষক, শ্রমিক, ছাত্রসহ গণ–মানুষের ভূমিকা প্রাধান্য পাবে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহের ব্যাপারে সবচেয়ে বড় প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ নেয়া হয় ১৯৭৭ সালে ''স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্পের" মাধ্যমে। ১৫ খন্ডের দলিল এবং ১ খন্ড আলোকচিত্র ইতিমধ্যে প্রকল্প থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এতে স্থানীয় পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ বিশেষ প্রাধান্য পায়নি। এর বেশ কয়েকটি সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমনঃ প্রথমত বিশাল দলির্লের কোথাও ঘাতক–দালালদের ভূমিকা সংক্রান্ত সুস্পষ্ট তথ্য নেই। অথচ এ বিষয়ে একটি খন্ড থাকা উচিৎ ছিল, তাতে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে স্বাধীনতা বিরোধীদের তৎপরতা জানা যেতো। দ্বিতীয়ত, অবরুদ্ধ বাংলাদেশে প্রতিটি মুহূর্তে মৃত্যুর প্রহর গুণে যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলো সেই গণমানুষের ওপর তথ্য ও দলিলপত্র অনুপস্থিত। বামপন্থী দলগুলোর ও°র তথ্যও যৎসামান্য। অথচ বামপন্থীদের বড় অংশটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছে। তৃতীয়ত, ১৫ খন্ডের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি, প্রবাসী সরকার, বিদেশী প্রতিক্রিয়া নিয়ে সংকলিত হয়েছে ১০ খন্ড। অবরুদ্ধ বাংলাদেশের তৃণমূল পর্যায়ে অর্থাৎ স্থানীয় পর্যায়ে গণহত্যা, বাঙালীর প্রতিরোধ, মুক্তিযুদ্ধ এসেছে ৫ খন্ডে, তাও বিক্ষিপ্তভাবে। মুক্তিযুদ্ধ ব্যাপকতার দিক থেকে এতো দীর্ঘ যে পনরতম খন্ডের ৪২ জনের সাক্ষাৎকার অকিঞ্চিতকর। নানা রাজনৈতিক দল, কর্মী, নেতৃবৃন্দ, ছাত্র সংগঠন, পেশাজীবী নাগরিক, বুদ্ধিজীবী, গ্রামীণ জনগণের উপস্থিতি অতি নগণ্য। অথচ সাক্ষাৎকার খন্ড অন্ততপক্ষে ২ খন্ডে হতে পারতো।

স্থানীয় ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও কিছু কিছু উদ্যোগ লক্ষণীয়। মুক্তিযুদ্ধে দিনাজপুরের ভূমিকা রচনার জন্যে ১৯৭২ সালের ২৫ এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হয় "মুক্তি সংগ্রামে দিনাজপুরের ভূমিকার ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ পরিষদ"। এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তৎকালীন শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক ইউসুফ আলী এম সি এ। পরিষদ ১২ পৃষ্ঠার একটি আবেদন পুস্তিকাও প্রকাশ করে। তাতে পরিষদের উদ্দেশ্য, প্রশ্নমালাসহ যাবতীয় তথ্য সন্নিবেশিত ছিল। অবশ্য এ উদ্যোগ সফল হয়নি। এর উদ্যোক্তাদের অনেকে নতুনভাবে উদ্যোগ নিয়েছেন। দিনাজপুরে এ উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছে "মুক্তিযুদ্ধ ও শহীদ স্মৃতি সংগ্রহ কমিটি।" এটি গঠিত হয়েছে ১৯৮৯ সালে। এ কমিটি দিনাজপুর অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার পরিকল্পনা নিয়েছে এবং বেশ কিছু তথ্য জমা হয়েছে। বইটিতে শহীদদের তালিকা ও জীবনী থাকবে দু'টি। একটিতে থাকবে তাদের নাম যারা দিনাজপুরের মাটিতে শহীদ হয়েছেন। অন্যটিতে থাকবে দিনাজপুরের বাইরে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের নাম। স্থানীয় স্বাধীনতা বিরোধীদের তালিকাও থাকবে। তা'ছাড়া থাকবে স্থানীয় পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা।[৩] স্থানীয় ইতিহাস রচনার

ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ও সফল উদ্যোগ নিয়েছে "মুক্তি সংগ্রাম স্মৃতি ট্রাস্ট, সুনামগঞ্জ"। ১৯৭৯ সালের ৩০শে মে ট্রাস্ট গঠিত হয়। ইতিহাস রচনা ছাড়াও ট্রাস্ট যে সকল কাজ করে তা হলোঃ (১) জেলার মেধাবী ছাত্র–ছাত্রী ও মুক্তিযোদ্ধাদের ছেলে–মেয়েদের বৃত্তি প্রদান; (২) যুদ্ধাহত ও অক্ষম মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থিক সাহায্য প্রদান, (৩) মুক্তিযুদ্ধের চেতনা উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে সভা সেমিনার করা, (৪) মুক্তিযোদ্ধাদের কবর ও স্মৃতি সৌধ সংরক্ষণ। বর্তমানে এ ট্রাস্টের স্থায়ী আমানত ১০ লক্ষ ৮৪ হাজার ২০২ টাকা।[৪] ১৯৯০ সালে এই ট্রাস্ট প্রকাশ করেছে "মুক্তিযুদ্ধে সুনামগঞ্জ" বই। স্থানীয় ইতিহাস রচনা ও তথ্য সংগ্রহের জন্যে আরো কিছু উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালা (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়) এ উদ্দেশ্যে বহু তথ্য সংগ্রহ করেছে। চুয়াডাঙ্গা ইতিহাস পরিষদ প্রকাশ করেছে "মুক্তিযুদ্ধে চুয়াডাঙ্গা" বই (১৯৮৯)।

তিন

এবার মুক্তিযুদ্ধের স্থানীয় ইতিহাস চর্চা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই। মুক্তিযুদ্ধের স্থানীয় ইতিহাস নিয়ে যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ

১. সামগ্রিকভাবে জেলা বা স্থানীয় পর্যায় ইতিহাসে মুক্তিযুদ্ধ;
২. স্থানীয় পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের ওপর বই।

স্বাধীনতার পর জেলা, মহকুমা বা স্থানীয় ইতিহাসের ওপর বেশ কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে। এ সকল বইয়ে স্থানীয় ভৌগোলিক অবস্থা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন, রাজনৈতিক অবস্থা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, সাংস্কৃতিক জীবন প্রাধান্য পেলেও মুক্তিযুদ্ধের স্থানীয় তৎপরতা বা ভূমিকা বিশেষ প্রাধান্য পায়নি। কোন কোন বইয়ে আলোচনায় একেবারেই মুক্তিযুদ্ধ আসেনি, আবার কোন কোন বইয়ে নিছক মুখরক্ষার জন্য কয়েক পৃষ্ঠা বরাদ্দ করা হয়েছে। এ ধরনের বই যেহেতু সরকারের স্থানীয় প্রশাসনের অর্থানুকূল্যে বা পৃষ্ঠপোষকতার প্রকাশিত হয় তাই মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সরকারী নীতি এতে প্রতিফলিত হয়। স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের রাজনৈতিক অবস্থানও এর মূলে ভূমিকা পালন করে। অনেকের ভূমিকা '৭১ এ স্বাধীনতা বিরোধী ছিলো এবং অনেকে মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান। কোন কোন বইয়ে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে প্রচুর বিকৃত ও মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। এমনি একটি বই খন্দকার আবদুর রহিমের 'টাঙ্গাইলের ইতিহাস'। বইয়ের ৪৮৫–৫৩৯ পৃষ্ঠায় মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বিকৃত তথ্য দেয়া হয়েছে।

স্থানীয় পর্যায়ে জেলা মহকুমা বা উপজেলা, থানার ইতিহাসে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে তথ্য পাওয়া যায় আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া সম্পাদিত ''কুমিল্লা জেলার ইতিহাস"; শ, ম, শওকত আলীর ''কুষ্টিয়ার ইতিহাস" (১৯৮২); তোফায়েল রচিত, ''নোয়াখালির বিষয়াবলী"; চৌধুরী মোঃ বদরুদ্দোজার ''জিলা পাবনার ইতিহাস"; এম, এম, আল ফারুকের ''ঝিনাইদহের ইতিহাস", মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন সম্পাদিত ''মানিকগঞ্জ জেলার ইতিহাস", সিরাজউদ্দিন সম্পাদিত ''বরিশালের ইতিহাস" চতুর্থ পর্ব; আসাদুজ্জামান আসাদের ''যশোর জেলার ইতিহাস"; জমির আহমেদের ''ফেণীর ইতিহাস" বইয়ে। ''কুষ্টিয়ার ইতিহাস" বইয়ের ৯৬–১১৪ পৃষ্ঠায় খুব সংক্ষেপে মুক্তিযুদ্ধে কুষ্টিয়ার রণাঙ্গনে, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠন ও মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান আলোচিত হয়েছে। ''নোয়াখালীর বিষয়াবলীর"র ১০৫–১১৪ পৃষ্ঠায় নোয়াখালীর শহীদ বুদ্ধিজীবীদের জীবনী আলোচিত হয়েছে। 'জিলা পাবনার ইতিহাসের' ১৯ পরিচ্ছেদে ১৪৩–১৮৩ পৃষ্ঠায় মুক্তিযুদ্ধে পাবনার ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে। ''ঝিনাইদহ জেলার ইতিহাস" বইযে ১৩৮–১৫৪ পৃষ্ঠায় ঝিনাইদহের বিভিন্ন প্রতিরোধ, শহীদ বুদ্ধিজীবী ও শহীদদের তালিকা রয়েছে। ''যশোর জেলার ইতিহাস" বইয়ের ৪১০–৫৬৫ পৃষ্ঠায় যশোরের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে। ''মানিকগঞ্জ জেলার ইতিহাসের" ৭০৩–৭৩৮ পৃষ্ঠায় মানিকগঞ্জের মুক্তিযুদ্ধের বর্ণনা আছে। "ফেণীর ইতিহাস" বইয়ের একটি অধ্যায়ে মুক্তিযুদ্ধে ফেণীর ভূমিকা (পৃঃ ১৮৪–১৮৯) আলোচিত হয়েছে। এ অধ্যায়ে জেলার মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েকজনের ওপর আলোচনা রয়েছে। এ অধ্যায়ে হানাদার বাহিনীর সহযোগী সম্পর্কে কোন বর্ণনা নেই। বরং হানাদার বাহিনীর দোসর হিসাবে পরিচিত ফেণীর হামিদুল হক চৌধুরী ও আবদুল জব্বার খদ্দরের মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকার কোন উল্লেখ না করে তাঁদের প্রশস্তিমূলক জীবনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। "বরিশাল জেলার ইতিহাস" বইয়ের চতুর্থ পর্ব (পৃঃ ৪৫৫–৬৫৯) ১৯৪৭–১৯৭১ পর্যন্ত বরিশালের রাজনীতি আলোচিত হয়েছে। বিশেষ করে পাকিস্তান ও বরিশালের রাজনীতি, ভাষা আন্দোলনে বরিশাল, আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে বরিশাল, সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধে বরিশাল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। জেলার ইতিহাসগুলোর মধ্যে একমাত্র এই বইয়ে মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা রয়েছে। "কুমিল্লা জেলার ইতিহাস" বইয়ে ৮৩৪–৮৫৫ পৃষ্ঠায় 'স্বাধীনতা যুদ্ধে কুমিল্লার অবদান' স্থান পেয়েছে। প্রায় ১০০০ পৃষ্ঠার এ বইয়ে মুক্তিযুদ্ধের জন্যে বরাদ্দ মাত্র ২১ পৃষ্ঠা।

মুক্তিযুদ্ধের স্থানীয় ইতিহাস নিয়ে যে সকল বই প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোও সংখ্যায় কম নয়। তবে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধের স্থানীয় ইতিহাস রচিত হয়েছে এ ধরনের সংখ্যা ২/৩টি মাত্র। বইগুলোতে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন দিক যেমন–রণাঙ্গন, যুদ্ধের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্ব, বা যোদ্ধার জীবনী ও কর্মকান্ড, গণহত্যা, অবরুদ্ধ এলাকার খন্ডচিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। এ বইগুলোর কয়েকটি দিনপঞ্জী আকারে লেখা। পূর্ণাঙ্গ স্থানীয় ইতিহাস রচনার প্রচুর তথ্য ও উপকরণ বইগুলোতে রয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ বইগুলোকে ৫ ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারেঃ

ক. মুক্তিযুদ্ধের স্থানীয় ইতিহাস রচনার প্রয়াস বা মূল্যায়ন

খ. রণাঙ্গন বা সশস্ত্র সংগ্রাম

গ. অবরুদ্ধ অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধ

ঘ. মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশ

ঙ. দলিলপত্র ও আলোকচিত্র

উল্লেখিত বিভাজন বইগুলোর প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। এটা নির্দিষ্টভাবে হয়তো বিজ্ঞানসম্মত নয়। এগুলোর মধ্যে এমন বইও রয়েছে যেটা একই সঙ্গে একাধিক শিরোনামভুক্ত হতে পারে।

ক. মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার প্রয়াস বা মূল্যায়ন

এখানে মুক্তিযুদ্ধের সার্বিক ইতিহাস রচনার প্রয়াস শিরোনামে যে বইগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা থেকে এ ধারণা করা ঠিক হবে না যে এ বইগুলোতে সামগ্রিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের স্থানীয় ইতিহাস লেখা হয়েছে। প্রত্যেকটি বইয়ে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে মুক্তিযুদ্ধকে বিবেচনা করা হয়েছে। এগুলোর সাহায্যে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা সহজ হতে পারে। এ ধারার বইয়ের সংখ্যা খুবই কম। উল্লেখযোগ্য বই ওহীদুল আলমের "চট্টগ্রামে মুক্তিযুদ্ধ" (১৯৯০), মোহাম্মদ আলী ইউনুছ সম্পাদিত "মুক্তিযুদ্ধে সুনামগঞ্জ" (১৯৯০), মাহবুব উল আলমের "বাঙালীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিবৃত্ত" (১৯৭৬)। সাহিত্যিক ওহীদুল আলমের লেখা "চট্টগ্রামে মুক্তিযুদ্ধ" নামক ৫২ পৃষ্ঠার বইয়ে সংক্ষেপে চট্টগ্রামের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। '৭১-এর অসহযোগ আন্দোলনে চট্টগ্রাম, প্রতিরোধ সংগ্রামে চট্টগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রামের নেতৃবৃন্দের ভূমিকা, চট্টগ্রামে গণহত্যা, চট্টগ্রামের বিভিন্ন রণাঙ্গনের বর্ণনা রয়েছে। শেষে রয়েছে মুক্ত চট্টগ্রামের বর্ণনা। সাধারণ কিছু বর্ণনা ছাড়া বইয়ে কোন বিশ্লেষণ নেই। "মুক্তিযুদ্ধে সুনামগঞ্জ" বইটিকে স্থানীয় ইতিহাস তত্ত্বের দিক থেকে মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ বলা চলে। এটি মুক্তিযুদ্ধের স্থানীয় ইতিহাস রচনায় একটি অনুকরণযোগ্য বই। বইটির প্রথম পর্বে সুনামগঞ্জ জেলার ভৌগোলিক বিবরণ, সাংস্কৃতিক জীবন, সুনামগঞ্জে মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক পটভূমি আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে সর্বদলীয় স্বাধীন বাংলা সংগ্রাম পরিষদ, সুনামগঞ্জ শহরে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ, সীমান্ত ও রণাঙ্গনে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ পর্বে সাব সেক্টরগুলো সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। সপ্তম পর্বে মুক্তিযোদ্ধা ও মিত্র বাহিনীর সুনামগঞ্জ অভিযান আলোচনায় এসেছে। অষ্টম পর্বে সুনামগঞ্জে পাকবাহিনীর গণহত্যা, শহীদদের তালিকা, প্রবাসী সুনামগঞ্জবাসীর ভূমিকা আলোচিত হয়েছে। বইটির শেষ অংশে নেতৃবৃন্দ, কমান্ডারদের পরিচয় ও অবদান তুলে ধরা হয়েছে।

বইয়ের একটি সীমাবদ্ধতা হচ্ছে স্থানীয় স্বাধীনতা বিরোধীদের নাম ও ভূমিকা অনুপস্থিত। মাহবুবুল আলমের "বাঙালীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিবৃত্ত" ৪ খন্ডে সার্বিক মুক্তিযুদ্ধের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। বইটির ত্রুটি অনেক। বিবরণের অসামঞ্জস্যতা এবং পুনরাবৃত্তি দোষেও দুষ্ট। তবে ঐকান্তিক প্রয়াসে আহরিত তথ্য গবেষকদের সহায়ক হবে। বিশেষ করে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের বিবরণ বিভিন্ন খন্ডে বিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া যাবে। হামিদুর রহমান মুন্সীর "মুক্তিযুদ্ধে চুয়াডাঙ্গা" আর একটি উল্লেখযোগ্য বই। এ বইয়ে চুয়াডাঙ্গার প্রতিরোধ সংগ্রাম, রণাঙ্গনে চুয়াডাঙ্গা জেলার চারটি উপজেলার মুক্তিযোদ্ধাদের নামের তালিকা রয়েছে। এতে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকাও রয়েছে। রাজাকারদের কোন তালিকা এতে নেই। সেলিনা হোসেনের "একাত্তরের ঢাকা" (১৯৯০) এ ধারার উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ঢাকায় '৭১ এর মার্চের উত্তপ্ত দিনগুলোর বর্ণনা, বাঙালীর প্রতিবাদ, স্বাধীনতার প্রস্তুতি পর্ব, ঢাকায় ২৫ মার্চে পাকবাহিনীর গণহত্যার সূচনা, ঢাকার গেরিলা অপারেশন, অবরুদ্ধ ঢাকার সংবাদপত্র, বুদ্ধিজীবী হত্যা, ঢাকায় আত্মসমর্পণ, বাঙালীর বিজয় এবং স্বাধীন ঢাকার বর্ণনা রয়েছে। বইটি থেকে ঢাকার মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যাবে।

খ. রণাঙ্গন বা সশস্ত্র সংগ্রাম

স্থানীয় পর্যায়ে রণাঙ্গনের বর্ণনা সম্বলিত বইয়ের সংখ্যা সর্বাধিক। মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন রণাঙ্গনের অবস্থা, প্রকৃতি জানার জন্যে এ ধারার বইগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ ধারার বইগুলোর কয়েকটি সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের লেখা। এদের লেখায় প্রায়ই যুদ্ধের রাজনৈতিক ভূমিকা ও নেতৃবৃন্দের ভূমিকাকে খাটো করে দেখানো হয়। '৭৫ এর পরবর্তীকালে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখলের পর সামরিক শাসনকে এক ধরনের বৈধতা প্রদানের জন্যে এ বিষয়কে আরো প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। এ সকল বইয়ের মূল সুর থাকে সামরিক বাহিনী যুদ্ধে অংশ নেয়ায় যুদ্ধ জয় সম্ভব হয়েছে। অথচ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট সংকলিত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা বিশ্লেষণ করে সাইয়িদ আতীকুল্লাহ্ ১৯৯০ সালে দৈনিক সংবাদের এক রিপোর্টিং এ মন্তব্য করেন, *"দেখা গেছে ৮৫ হাজার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার ৫৯ হাজার ৫শ ৭০ জন ছিলেন বেসামরিক এবং বেশীর ভাগ ছিলেন কৃষক পরিবারের সন্তান।"*[৫] তবে বেসামরিক অনেক ব্যক্তিও এ বিষয়ে কয়েকটি বই লিখেছেন। এ বইগুলো থেকে যুদ্ধের অবস্থা ও সাংগঠনিক বিবরণ পাওয়া যায়। যদিও কোন কোন বইয়ে নিজস্ব ভূমিকার অতিরঞ্জন প্রকাশ প্রবণতা লক্ষনীয়। তবে কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বইগুলো থেকে স্থানীয় ইতিহাস রচনার অনেক উপকরণ পাওয়া যায়।

রণাঙ্গনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে। এধারার সর্বপ্রথম প্রকাশিত বই সত্যেন সেনের ''প্রতিরোধ সংগ্রামে বাংলাদেশ''। ১৯৭১ সালের আগস্টে বইটি মুক্তধারা (কোলকাতা) থেকে প্রকাশিত হয়। এ বইয়ে

বাংলাদেশের বিভিন্ন রণাঙ্গনের যেমন–চট্টগ্রাম, খুলনা, ঢাকা, বগুড়া, কুষ্টিয়া, পাবনা, বরিশাল, ফেণী, দিনাজপুর, যশোর এলাকার বর্ণনা আছে। মূলত শরণার্থীদের কাছে শোনা ঘটনার ওপর ভিত্তি করে সাংবাদিক ও সাহিত্যিক সত্যেন সেন এ বইটি রচনা করেন। ভারতে জনমত গড়ে তোলায় বইটির অবদান রয়েছে। ৭ নং সেক্টরের সাবসেক্টর কমান্ডার রফিকুল ইসলাম পি,এস, সি'র লেখা ''একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে'', "একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এগারোটি সেক্টরের বিজয় কাহিনী", "একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ প্রতিরোধের প্রথম প্রহর", "১৯৭১ ঢাকায় সশস্ত্র প্রতিরোধ", "বাংলাদেশের গেরিলা যুদ্ধ" বইগুলো রণাঙ্গনের ইতিহাস জানার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ। "একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে" বইয়ে মুক্তিযুদ্ধ গড়ে উঠার কারণ, সেনাবাহিনী সংগঠন, বিভিন্ন সেক্টরের যুদ্ধের বিবরণ, মুক্তিযুদ্ধের অগ্রাভিযান ও চূড়ান্ত যুদ্ধ, সর্বোপরি ১৬ই ডিসেম্বর মিত্রবাহিনী ও এগারো নং সেক্টরের মুক্তিবাহিনীর বিজয় উল্লাসের মাধ্যমে ঢাকা নগরীতে প্রবেশ এবং পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পণ আলোচিত হয়েছে। বেলুনিয়ার বিখ্যাত যুদ্ধ, আট গ্রামের ঘেরাও অভিযান, চিলমারী সংঘর্ষের মতো বেশ কয়েকটি যুদ্ধের বর্ণনা বইটিতে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে "প্রতিরোধের প্রথম প্রহর" (১৯৯০) বইটিতে ২৫শে মার্চের পর দেশের কয়েকটি অঞ্চলে যেমন–ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, সিলেট, কুমিল্লা, কুষ্টিয়া, যশোর, রাজশাহী, দিনাজপুরে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে কিভাবে প্রতিরোধ সংগ্রামের সূত্রপাত হয় তার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। "এগারোটি সেক্টরের বিজয় কাহিনী" (১৯৯০) বইটিতে সেক্টরের রণনীতি–রণকৌশল, যোদ্ধাদের অবদান, যুদ্ধ এবং বাঙালীর বিজয় আলোচিত হয়েছে। বই দু'টি পক্ষপাতদুষ্ট। যুদ্ধে সেনাবাহিনীর ভূমিকাকে ফলাও করে প্রচার করা হয়েছে। কিন্তু তা কি সঠিক? প্রতিরোধ এবং ১১টি সেক্টরের যুদ্ধের যে কাহিনী মেজর রফিক তুলে ধরেছেন তার সবগুলোতেই অধিপতি দেখানো হয়েছে সেনাবাহিনীকে। প্রতিরোধ সংগ্রামে জনগণ ও রাজনৈতিক কর্মীদের ভূমিকা প্রায়ই অনুপস্থিত। অথচ ইতিহাসের সত্য ঘটনা হচ্ছে জনগণ ও রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের ভূমিকায় অনুপ্রাণিত হয়েই কেবল ইপিআর, ইবি আর, বাঙালী জোয়ানরা অস্ত্র তুলে নিয়েছিল। পাশাপাশি একথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, কোন কোন বাঙালী সামরিক অফিসার শুরুতে বিদ্রোহ করতে সম্মত ছিলেন না। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীতে তাদের জীবন নিরাপদহীন হয়ে পড়ায় এবং মৃত্যু অবধারিত জানার পরই তারা প্রতিরোধ সংগ্রামের সাথে যুক্ত হন।[৬] বই দুটোতে মেজর রফিক একটি রাজনৈতিক যুদ্ধকে সুকৌশলে সামরিক যুদ্ধ বলে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। মেজর রফিকুল ইসলামের "বাংলাদেশের গেরিলা যুদ্ধ" (১৯৯২) বইয়ে ঢাকা, কুমিল্লা, ফরিদপুর, টংগী, নরসিংদী, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, লাকসাম, নোয়াখালী, বরিশাল, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের গেরিলা অভিযানের বর্ণনা রয়েছে। এ বইয়ে বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান, রাজাকারদের ভূমিকার বর্ণনাও রয়েছে, যদিও বইগুলোতে পুনরাবৃত্তিমূলক তথ্য রয়েছে।

খুলনা বিভাগের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানা যায় বাবর আলীর লেখা "স্বাধীনতার দুর্জয় অভিযান" বইয়ে (১৯৯১)। এতে বৃহত্তর খুলনার তিনটি জেলা খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাটের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ, রাজাকারদের তৎপরতা, স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা ও সংগঠক এবং কমান্ডারদের ছবি ও পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। লেখক নিজেও মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন বলে রণাঙ্গনের চিত্র সুদক্ষভাবে তুলে ধরতে পেয়েছেন। রাজশাহী বিভাগের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বেশ কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে। আবুল কালাম আজাদের "মুক্তিযুদ্ধের কিছু কথা – পাবনা জেলা" (১৯৯২), মাহবুব আলমের "গেরিলা থেকে সম্মুখ যুদ্ধে" (১৯৯২), মোঃ আবদুল হামিদের "একাত্তরের সৈয়দপুর" (১৯৯১), আখতারুজ্জামান মন্ডলের "উত্তর রণাঙ্গনের বিজয়" (১৯৯০), খোন্দকার আখতার আলীর "স্বাধীনতা সংগ্রামে রাজশাহীর ভূমিকা" উল্লেখযোগ্য বই। "উত্তর রণাংগনের বিজয়" বইটিতে রংপুরের মুক্তিযুদ্ধের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। ইপিআর ও ছাত্র যুবকদের প্রতিরোধ, মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন, রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধাদের কৃতিত্ব তুলে ধরা হয়েছে। লেখক নিজে ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার। তাই কাছে থেকে দেখা যুদ্ধগুলোর বর্ণনা তিনি গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন। বইটিতে পাকিস্তানী বাহিনী ও রাজাকারদের তৎপরতা, গণহত্যার বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। অবসরপ্রাপ্ত ডিএসপি আবদুল হামিদ তাঁর "একাত্তরে সৈয়দপুর" বইয়ে বিহারী অধ্যুষিত সৈয়দপুরে বাঙালীর প্রতিরোধ, রণাঙ্গনে মুক্তিযুদ্ধ এবং সৈয়দপুরের বিজয়গাঁথার বর্ণনা দিয়েছেন। মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মাহবুব আলমের "গেরিলা থেকে সম্মুখ যুদ্ধ" বইয়ে পঞ্চগড় জেলা ও সীমান্তবর্তী এলাকার মুক্তিযুদ্ধের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। বর্ণিত যুদ্ধে লেখকও অংশ নিয়েছিলেন বলে সুদক্ষভাবে যুদ্ধের চিত্র তুলে ধরেছেন। স্থানীয় রাজাকারদের তৎপরতার বিবরণ লেখক নিরপেক্ষভাবে তুলে ধরেছেন। যে সকল রাজাকার যুদ্ধের এক পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করেছিল তাদের ভূমিকা ও তুলে ধরেছেন। প্রতিটি অপারেশন ও রণাঙ্গনের মানচিত্র, মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা, শহীদদের তালিকা বইটির বাড়তি আকর্ষণ। রণাঙ্গনের ইতিহাস রচনায় বইটি অনুকরণযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে।

ঢাকা বিভাগের রণাঙ্গনের বর্ণনা পাওয়া যায় বেশ কয়েকটি বইয়ে। হেদায়েত হোসাইন মোরশেদের "স্বাধীনতা সংগ্রামে ঢাকায় গেরিলা অপারেশন" বইটি ঢাকা নগরীতে মুক্তিবাহিনীর গেরিলা তৎপরতা ও অপারেশনের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এর সময়কাল ১৯৭১ সালের জুলাই থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। মেজর রফিকুল ইসলামের "ঢাকায় সশস্ত্র প্রতিরোধ" বইয়ে ঢাকার প্রতিরোধ, গণহত্যা, গেরিলা তৎপরতার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। মীর মাহবুব আলীর "দুর্জয় ঘাটি" বইতে বৃহত্তর ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ, বিক্রমপুর, নবাবগঞ্জ, দোহার অঞ্চলের রণাঙ্গনের বিবরণ রয়েছে। এ সকল অঞ্চলের রনাঙ্গনের বিবরণ পাওয়ার জন্য অপর গুরুত্বপূর্ণ বই "সাপ্তাহিক বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের ৭০ দিন"। "সাপ্তাহিক বাংলাদেশ" পত্রিকা মুক্তিযোদ্ধা মিজানুর রহমানের সম্পাদনায় নবাবগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হতো। যুদ্ধের খবরাখবর জানার জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ

বই। নবাবগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হওয়ায় প্রধানত নবাবগঞ্জ ও দোহার এলাকার মুক্তিযুদ্ধের তৎপরতা জানা যায়।

স্থানীয় ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে বজলুল মজিদ খসরু এবং রেহান উদ্দিন আহমদ সম্পাদিত "একাত্তরের সুনামগঞ্জ" বইটিও গুরুত্বপূর্ণ। মোট এগারটি নিবন্ধ নিয়ে এ বই। লেখকদের সকলেই যুদ্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ছাতক অভিযান, দিরাইশালা যুদ্ধসহ সুনামগঞ্জের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধের বিবরণ রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে রণাঙ্গন সম্পর্কিত দু'টি ইংরেজী বইয়ের বিষয় আলোচনায় আনা উচিৎ। ১ নং সেক্টর কমান্ডার রফিকুল ইসলামের "এ টেল অব মিলিয়নস" বইটি "লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে" (১৯৮১) নামে অনূদিত হয়। বইটিতে সেক্টরের যুদ্ধগুলোর বিবরণ রয়েছে। মেজর জেনারেল কে, এম, শফিউল্লাহর "বাংলাদেশ এ্যাট ওয়ার" অপর গুরুত্বপূর্ণ বই। লেখক মুক্তিযুদ্ধের ৩ নং সেক্টর কমান্ডার ছিলেন। তাঁর ব্রিগেডের নাম এস ফোর্স। প্রধান সেক্টর গুলোর রণনীতি, যুদ্ধ, সেক্টরগুলোর আঞ্চলিক বিন্যাস, সেক্টর কমান্ডার, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের তালিকা রয়েছে। কাদের সিদ্দিকী মুক্তিযুদ্ধে টাংগাইলের বিস্তীর্ণ এলাকায় যুদ্ধ পরিচালনা করেন। গড়ে তোলেন কাদেরীয়া বাহিনী। তাঁর বই "স্বাধীনতা '৭১" (২ খন্ডে) টাংগাইলের মুক্তিযুদ্ধের বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়। মুক্তিযোদ্ধাদের নাম পরিচয় এতে রয়েছে। টাংগাইলের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আরো জানা যায় মোহাম্মদ মোদাব্বেরের 'মুক্তিসংগ্রামে বাঘা সিদ্দিকী' (১৯৭৩), সুনীল কুমার গুহের 'মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবীর বাঘা সিদ্দিকী' (১৯৭৩) বইয়ে। এছাড়া যে সকল বইয়ে রণাঙ্গনের চিত্র পাওয়া যায় তাহলো কাজী জাকির হোসেনের 'মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলো' (১৩৯৬)। এ বইয়ে কালিগঞ্জ, আদিতমারী, বড়বাড়ি, মোগলহাট, লালমনিরহাটের বিভিন্ন রণাঙ্গনে মুক্তিবাহিনী ও পাকবাহিনীর সম্মুখ যুদ্ধের বিবরণ রয়েছে। মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত 'একাত্তরের বিজয় গাঁথা' (১৯৯২) বইয়ে জয়দেবপুর, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, শেরপুর, জামালপুর, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, চাঁদপুর, সুনামগঞ্জ, কক্সবাজার, মৌলভী বাজার, রাজশাহী, পাবনা, রংপুরসহ মোট ৪৫টি এলাকার মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি, যুদ্ধ, নেতৃবৃন্দের ভূমিকা, মুক্তিযোদ্ধাদের নাম ও ভূমিকা রয়েছে। শাহরিয়ার কবির সম্পাদিত ''সেক্টর কমান্ডাররা বলেছেন মুক্তিযুদ্ধের স্মরণীয় ঘটনা'' (১৯৯২) বইয়ে সেক্টর কমান্ডার কাজী নুরুজ্জামান, সি, আর, দত্ত, মীর শওকত আলী, আবু ওসমান চৌধুরী, শফিউল্লাহ, হামিদুল্লাহ, রফিকুল ইসলামের স্মৃতিচারণ রয়েছে। নিজ নিজ সেক্টরের যুদ্ধের বিবরণ এতে আলোচিত হয়েছে। সেজান মাহমুদের ''মুক্তিযুদ্ধের সেরা লড়াই'' (১৯৯২) বইয়ে বেশ কয়েকটি রণাঙ্গন– কুমিল্লা, কুষ্টিয়া, কামালপুর, শালদা, চিলমারী, ভুরুঙ্গমারী, বেলুনিয়া, আখাউড়ার যুদ্ধের বর্ণনা রয়েছে। বাঙালীর বিজয় সাহিত্যিক সেজানের কলমে সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। আবু ওসমান চৌধুরী ছিলেন ৮ নং সেক্টর কমান্ডার। তাঁর ''এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম''

(১৯৯১) বইয়ে ১১৭-৪৮১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাক বাহিনীর আক্রমণ, বাঙালীর প্রতিরোধ ও বিজয়, মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ তুলে ধরেছেন।

উল্লেখিত বই ছাড়াও নিম্নলিখিত বইগুলোতে বিভিন্ন রণাঙ্গনের বর্ণনা পাওয়া যায় (দ্রষ্টব্য, সারণী - ১)।

স্মারণী–১

* আতোয়ার রহমান সম্পাদিত, *আমরা মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম* (১৯৯১)
* অঞ্জন কর্মকার, *তখন আমরা যুদ্ধে* (১৯৮৯)
* এম আর আখতার মুকুল, *ওরা চারজন (খালেদ মোশাররফ, জিয়াউর রহমান, শফিউল্লাহ, মীর শওকত)* (১৯৮৭)
* এম আর আখতার মুকুল, *লেছুড়াগঞ্জেরলড়াই* (১৯৮৮)
* এম আর আখতার মুকুল, *আমিই খালেদ মোশাররফ* (১৯৯০)
* খুরশিদ উজ্জামান, *রেলপথে মুক্তিযুদ্ধ* (১৯৯১)
* নবী ভাই, *রণাঙ্গনেবাংলাদেশ* (১৩৭৮)
* বরুণ সেন, *চট্টগ্রাম'৭১* (১৯৭২)
* বেদুইন, *বাংলার রণাঙ্গনে* (১৩৭৮)
* মেজর আবদুল জলিল, *সীমাহীন সমর* (১৯৭৪)
* মেজর এম, এস, ভূঁইয়া, *মুক্তিযুদ্ধে নয় মাস* (১৯৮৫)
* মেজর রফিকুল ইসলাম, *একাত্তরের বিশটি ভয়াবহ যুদ্ধ* (১৯৯২)
* শামছুল হুদা চৌধুরী, *রণাঙ্গনেমেজরশফিউল্লাহ* (১৯৮১)
* সিরাজুল ইসলাম সাগর, *পাঁচ বিবির যুদ্ধ*
* সেজান মাহমুদ, *অপারেশনজ্যাকপট* (১৯৯১)

রণাঙ্গন বা সশস্ত্র সংগ্রাম ধারার কয়েকটি বই যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত ভারতীয় মিত্র বাহিনীর কয়েকজন অফিসারও লিখেছেন। যদিও তাদের লেখায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রাধান্য পায়নি, এ যুদ্ধ তাঁদের দৃষ্টিতে পাক-ভারত যুদ্ধ। তবে রণাঙ্গন যেহেতু বাংলাদেশ ছিল তাই এ বইগুলো থেকে যুদ্ধে ভারতের নীতি, মিত্র বাহিনীর রণনীতিসহ স্থানীয় পর্যায়ে যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। সবগুলো বই ইংরেজীতে লেখা (দ্রষ্টব্য, সারণী-২)।

সারণী - ২

* K. P. Candeth (Lt. Gen), *The Western Front : The Indo-Pakistan War 1971* (New Delhi : 1984)
* S. K. Garg (Capt), *Spotlight Freedom Fighters of Bangladesh* (Dhaka : 1984)
* D. K. Palit (Maj-Gen), *The Lightning Campaign : The Indo-Pakistan War 1971* (New Delhi : 1972)
* Lachhman Singh (Maj-Gen), *India Sword Strikes in East Pakistan* (New Delhi : 1979)
* Lachhman Singh (Maj-Gen), *Victory in Bangladesh* (New Delhi : 1981)
* Sukhwant Sing (Maj-Gen), *The Liberation of Bangladesh* Vol & II, New Delhi : 1981)
* H. S. Sodhi (Brig), *"Operation Windfall" Emergence of Bangladesh* (New Delhi : 1980)
* S. S. Uban (Maj-Gen), *Phantoms of Chittagong, The Fifth Army in Bangladesh* (New Delhi : 1985)

গ. অবরুদ্ধ অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধ

মুক্তিযুদ্ধের ন'মাসে সারা বাংলাদেশ ছিল মূলত অবরুদ্ধ দেশ। অবরুদ্ধ বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি পরিবার কোন না কোন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাদের এই নির্যাতন চিত্র, মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা নিয়ে কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে। প্রত্যেকটি বইয়ে পাক বাহিনী ও রাজাকারদের নির্যাতন চিত্র ফুটে উঠেছে। অন্যদিকে মুক্তিবাহিনীর দৃঢ়তা, প্রতিরোধ ও বিজয়ের চিত্র ফুটে উঠেছে। এধারার বইগুলোর মধ্যে ঢাকা শহরের বর্ণনা পাওয়া যায় বেশ কয়েকটি বইয়ে। এগুলোর মধ্যে প্রথমেই আসে জাহানারা ইমামের

"একাত্তরের দিনগুলি" (১৯৮৬) বইটি। লেখিকা ১৯৭১-এর ঢাকা শহরের অবস্থা দিনলিপি আকারে উপস্থাপিত করেছেন। বইয়ে ১লা মার্চ থেকে ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ এর প্রাঞ্জল বিবরণ রয়েছে। বইয়ে ঢাকার গেরিলা অপারেশন, মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব, পাক বাহিনীর নির্যাতন চিত্র ফুটে উঠেছে। শহীদ অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতার স্ত্রী বাসন্তী গুহঠাকুরতা অবরুদ্ধ ঢাকা শহরের নিখুঁত চিত্র এঁকেছেন তাঁর "একাত্তরের স্মৃতি" (১৯৯১) বইয়ে। বইটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার গণহত্যা ও পাকবাহিনীর নির্যাতনের একটি প্রামাণ্য দলিল। তিনি অবরুদ্ধ ঢাকায় পাক বাহিনীর বর্বরতা, ধ্বংসযজ্ঞ খুব কাছে থেকে দেখেছেন এবং বইয়ে তুলে ধরেছেন। "নিষিদ্ধ নিশ্বাস" (১৯৭৪) বইয়ে জহরুল হক অবরুদ্ধ ঢাকার বর্ণনা দিয়েছেন। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত দিনপঞ্জী আকারে বইটি লেখা। ঢাকার বিভিন্ন অঞ্চলের বিবরণ এতে আছে, পাকবাহিনীর নির্যাতন থেকে শুরু করে মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় পর্যন্ত। ঢাকার বর্ণনার জন্যে বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের "জার্নাল ৭১" (১৯৭৩) এবং পান্না কায়সারের 'মুক্তিযুদ্ধ আগে ও পরে' (১৯৯১) গুরুত্বপূর্ণ বই। মার্কিন মিশনারী জিম ম্যাকিনলের 'ডেথ টু লাইফ : বাংলাদেশ' (অনুবাদ করেছেন মফিদুল হক "যুদ্ধ দিনের কথা" নামে)। বইয়ে ফেনী, কুমিল্লা ও ঢাকায় পাকবাহিনীর নির্যাতন চিত্র ফুটে উঠেছে। বইয়ে লেখক মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের কাহিনী তুলে ধরেছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে বেশ কিছুদিন কাটানোর ফলে লেখক তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পান। মার্কিন, চীন ও পাকিস্তানের নীতির সমালোচনা করা হয়েছে বইয়ে। এ ধারার বইগুলোর মধ্যে তাজুল মোহাম্মদ এর লেখা "সিলেট গণহত্যা" (১৯৮৯) মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থরাজীতে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বইতে মুক্তিযুদ্ধে সিলেটের বীরত্বপূর্ণ অবদান, প্রতিরোধে সিলেটবাসীর অবদান জানা যাবে। বইতে পাকবাহিনী ও দালালদের নির্যাতন চিত্র ও ধ্বংসযজ্ঞ বেশি ফুটে উঠেছে। ১৯০ পৃষ্ঠার বইতে ৪৫টি স্থানের পাকবাহিনীর নির্যাতন ও অপারেশন চিত্র ফুটে উঠেছে। বইটিতে যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে যার থেকে সমাজে বর্তমানে তাদের অবস্থান জানা যাবে। অন্যদিকে রাজাকারদের বর্তমান সমৃদ্ধ অবস্থার বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

প্রবীণ লেখক আতোয়ার রহমানের "একাত্তরঃ নির্যাতন কড়চা" (১৯৯২) এধারার গুরুত্বপূর্ণ বই। মুক্তিযুদ্ধের সময় লেখক অবরুদ্ধ ঢাকায় ছিলেন। পরবর্তীতে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে তিনি এ বইটি রচনা করেছেন। নির্যাতন ও হত্যার শিকার বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার বুদ্ধিজীবী, ছাত্র, ব্যবসায়ী, চাকুরে, কৃষক বা খেটে খাওয়া মানুষের নির্যাতন চিত্র ফুটে উঠেছে। আসাদুজ্জামান আসাদের "একাত্তরের গণহত্যা ও নারী নির্যাতন" (১৯৯২) ঢাকা, যশোর, কুষ্টিয়া, বরিশাল, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী,সিলেট, কুমিল্লা, রংপুর, রাজশাহী, নাটোর, চাঁদপুর, খুলনা, ভোলা, ময়মনসিংহসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের গণহত্যা ও নির্যাতন চিত্র বর্ণিত হয়েছে। কবি সুফিয়া কামালের "একাত্তরের ডায়েরী" (১৯৮৯) বইটিও গুরুত্বপূর্ণ। ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৭০ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর '৭১ পর্যন্ত ঢাকা শহরের ঐসময়ের অবস্থা জানা যায়। মাহমুদ হাসান "দিনপঞ্জী একাত্তর" (১৯৯১) বইয়ে ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ইতিহাস দিনপঞ্জী আকারে

লিপিবদ্ধ করেছেন। এতে স্থানীয় পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের কর্মসূচী, মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব, অন্য দিকে পাকবাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ ও নির্যাতন সম্পর্কে জানা যাবে। হারুন হাবীবের "প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে মুক্তিযুদ্ধ" (১৯৯১) বইয়ে মুক্তিযুদ্ধের স্থানীয় ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে। অসহযোগ আন্দোলনের বর্ণনা পাওয়া যায় স্বদেশ রায়ের "বিক্ষুব্ধ মার্চ ৭১" (১৯৯১) এবং মেজর রফিকুল ইসলামের " বিদ্রোহী মার্চ ১৯৭১" (১৯৯২) বইয়ে। বিশিষ্ট রাজনৈতিক কর্মী ও শিক্ষক হেনা দাস রচনা করেছেন "স্মৃতিময় '৭১"। এতে মুক্তিযুদ্ধে নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, অঞ্চলের বিবরণ পাওয়া যায়। সাবেক ছাত্র নেতা ও মুক্তিযোদ্ধা এম, এ, বারীর "মুক্তিযুদ্ধের রক্তিম স্মৃতি" বইয়ে পাকিস্তানী বাহিনীর গণহত্যা, আনসার, পুলিশ, ইপি আর-এর ভূমিকা, ১১টি সেক্টরের বর্ণনা রয়েছে। লেখিকা সাহিদা বেগমের "যুদ্ধে যুদ্ধে নয় মাস" বইয়ে ঢাকা, গাইবান্ধা,রংপুর, এলাকার অবরুদ্ধ অবস্থার বর্ণনা রয়েছে। এছাড়াও এধারার বেশ কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে (দ্রষ্টব্য, সারণী-৩)

সারণী – ৩

* আতাউর রহমান খান, *অবরুদ্ধ নয় মাস* (১৯৯১)
* আবদুল খালেক, *জল্লাদের জিন্দান খানায়* (১৩৭৮)
* আশেক মাহমুদ (সম্পাদিত), *১৯৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রাম, গণহত্যা ও পাশবিক নির্যাতন* (১৩৭৮)
* নার্গিস ইসলাম নাজমা, *পরবাসে '৭১* (১৯৭২)
* নুরুন নাহার বেগম, *স্মৃতিতে১৯৭১* (১৯৯২)
* বেগম মুশতারী শফি, *স্বাধীনতা আমার রক্ত ঝরা দিন* (১৯৮৯)
* মনজুর আহমদ, *একাত্তর কথা বলে* (১৯৯০)
* মন্টু খান, *হায়েনার খাঁচায় অদম্য জীবন* (১৯৯০)
* মেজর রফিকুল ইসলাম, *ভয়াবহ গণহত্যা* (১৯৯২)
* মোস্তাক হোসেন, *একাত্তরের পাক বাহিনীর বন্দী শিবির* (১৯৮৯)
* রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, *একাত্তরের দশ মাস* (১৯৯১)
* লায়লা সামাদ, *কড়চা ৭১* (১৯৭৫)
* সাখাওয়াত হোসেন মজনু, *নির্যাতন '৭১* (১৯৯১)
* সামাদ শিকদার, *মুক্তিযুদ্ধ ও আমি* (১৯৯১)
* হারুনুর রশিদ, *'৭১ এর নারী নির্যাতন, স্বাধীনতা* (১৯৯১)

এধারার কিছু ইংরেজী বইও প্রকাশিত হয়েছে (দ্রষ্টব্য, সারণী – ৪)।

সারণী – ৪

* Kalyan Chaudhuri, *Genocide in Bangladesh* (New York : 1972)
* Abul Hasnat, *The Ugliest Genocide* (Dacca : 1974)
* Rafiqul Islam (Maj) *Genocide in Bangladesh : Harrowing accounts or some Eye-Witness and the Extracts from the Press* (Dhaka) ; 1991)
* Jahanara Imam, *of Blood and Fire* (Dacca : 1990)
* Mafizullah Kabir, *Experiences of an exile at home, life in Occupied Bangladesh* (Dacca : 1972)
* Jim Mackinly, *Death to life : Bangladesh* (Dacca : 1979)
* Jag Mohan, (ed), *The Black Book of Genocide in Bangladesh* (New Delhi : 1971)
* Abdul Wahab, *One Man's agony* (Dacca : 1972)

ঘ. *মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশ*

১৯৭১ সালে গণহত্যার জন্যে যেমন দায়ী ছিলো পাকিস্তানী বাহিনী, তেমন দায়ী তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আলবদর ও আল–সামসরা। এরাই সম্মিলিতভাবে রচনা করেছিল মানব জাতির ইতিহাসে এক জঘন্য কলংকিত অধ্যায়। অভিযোগ রয়েছে যে, এ দালালচক্রের প্রত্যক্ষ ছত্রছায়ায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মুক্তিযোদ্ধারা আজো হচ্ছে লাঞ্ছিত, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হচ্ছে হুমকির সম্মুখীন। *মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশ* শিরোনামে ঐ সকল বই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যাতে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলী এমনভাবে বর্ণিত হয়েছে জনগণ সচেতন হতে পারে, হানাদার বাহিনীর দোসরদের স্বরূপ চিনতে পারে। শহীদ মুক্তিযোদ্ধা, বুদ্ধিজীবীদের জীবনীমূলক গ্রন্থও এধারার বইয়ের অন্তর্ভুক্ত, কারণ এ সকল বইয়ে পাকিস্তানী বাহিনী ও রাজাকারদের হাতে তাদের নির্মম অত্যাচারের বর্ণনা রয়েছে। এ ধারার আলোড়ন সৃষ্টিকারী বই "একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়"

(১৯৮৭)। এতে স্বাধীনতা বিরোধী দালালদের মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা, পুনর্বাসন, বর্তমান কর্মকান্ড তুলে ধরা হয়েছে। '৭১ এ বিভিন্ন এলাকায় এদের কর্মকান্ড বইয়ে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। এ ধরনের অপর গুরুত্বপূর্ণ বই শফিক আহমদের "একাত্তরের দালালেরা" (১৩৯৪)। বইটিতে ৬০০ দালালের নাম, ঠিকানাসহ সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত রয়েছে। মোস্তাক হোসেনের "একাত্তরের ঘাতক ও দালালদের বিচার" (১৯৯০) বইটিতে দালালদের বিচারের বিবরণী প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৭২ ও ১৯৭৩ সালে বিভিন্ন পত্রিকায় এগুলো প্রকাশিত হয়েছিল। এর থেকে বিভিন্ন অঞ্চলে রাজাকারদের তৎপরতা জানা যাবে। পারভেজ হোসেন "একাত্তরের ঘাতক ও দালালদের অতীত ও বর্তমান" (১৯৯২) বইয়ে দশজন শীর্ষ স্থানীয় রাজাকারের '৭১ এর কর্মকান্ড তুলে ধরেছেন। এ ধারার আরো কিছু বই বাংলা ও ইংরেজীতে প্রকাশিত হয়েছে (দ্রষ্টব্য, সারণী – ৫)।

সারণী – ৫

* আলী আকবর ঢালী, *মুক্তিযুদ্ধে দৈনিক সংগ্রামের ভূমিকা* (১৯৯২)
* নুরুল ইসলাম (সম্পা), *একাত্তরের ঘাতক দালাল যা বলেছেন যা করেছেন* (১৯৯১)
* ফরিদ কবির (অনূদিত), *মুক্তিযুদ্ধের ঘাতক* (১৯৮৮)
* শাহরিয়ার কবির (সম্পা), *একাত্তরের ঘাতক জামাতে ইসলামীর অতীত ও বর্তমান* (১৯৮৯)
* Alimuzzaman Choudhury, *Bangladesh Collaborators (Special tribunals) Order, 1972*, With Commentaries (Dacca : 1972)
* Ahmed Naziruddin, *Trial of Collabotators*
* Ahmed Sharif, (ed), *Genocide '71, an account of the Killers and Collaborators* (Dhaka : 1988)

মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয়ের প্রাক্কালে পাকিস্তানীদের দালালরা হত্যা করেছিল বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধিজীবীদের। মুক্তিযুদ্ধে তাদের অবদান, জীবনী এবং হত্যাকান্ডের বিবরণ সম্বলিত বেশ কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে। রশীদ হায়দার সম্পাদিত "স্মৃতি ১৯৭১" ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ খন্ড, "১৯৭১ ভয়াবহ অভিজ্ঞতা" (১৯৮৯) উল্লেখ যোগ্য বই। 'স্মৃতি ১৯৭১' ১ম খন্ডে ৩৯ জন, দ্বিতীয় খন্ডে ৩৯ জন, তৃতীয় খন্ডে ২৮ জন, ৪র্থ খন্ডে ২৯ জনসহ মোট ১২৫ জন শহীদ বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে স্মৃতিচারণ প্রকাশিত হয়েছে। "১৯৭১ ভয়াবহ অভিজ্ঞতা" বইয়ে ৫০ জন ব্যক্তির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি সম্পাদিত "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শহীদ স্মরণে" (১৯৮৮) বইয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী,

ছাত্রদের জীবনী ও তালিকা রয়েছে। অনুরূপ উদ্যোগ নিয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রকাশ করেছে "মুক্তিযুদ্ধের শহীদ : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়" (১৯৮৭)। স্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের উপর লেখা সরকার আবুল কালামের "নরসিংদীর শহীদ বুদ্ধিজীবী" (১৯৯১) বইটি উল্লেখযোগ্য। এতে শহীদ আসাদ, ডঃ সাদত আলী, সরোজ কুমার নাথ, মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ, মোহাম্মদ সামসুজ্জামান, ফজলুর রহমান, গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, বীর শ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের জীবনী ও মুক্তিযুদ্ধে অবদান সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। জাহানারা ইমামের "বীর শ্রেষ্ঠ" (১৩৯১) বইয়ে বীর শ্রেষ্ঠদের মুক্তিযুদ্ধে অবদানসহ জীবনী লিপিবদ্ধ হয়েছে। শহীদ বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে আরো কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে (দ্রষ্টব্য, সারণী–৬)।

সারণী – ৬

* আকরম হোসেন (সম্পা), *মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, আনোয়ারপাশা* (১৯৭২)
* আমিনুল ইসলাম, *গোবিন্দ চন্দ্র দেব* (১৯৮৯)
* আমিরুল ইসলাম ও আসলাম সানী (সম্পা), *আমার বাবা শহীদ বুদ্ধিজীবী সন্তানদের স্মৃতিকথা* (১৯৯১)
* আসলাম সানী, *শত শহীদ বুদ্ধিজীবী* (১৯৯২)
* ইফতেখার কাজল (সম্পা), *মুক্তিযুদ্ধে শহীদ প্রকৌশলী স্মৃতিকথা* (১৯৯১)
* ইফতেখার কাজল (সম্পা), *মুক্তিযুদ্ধে শহীদ চিকিৎসকদের স্মৃতিকথা* (১৯৯১)
* কবীর চৌধুরী, *মুনীরচৌধুরী, ১৯২০–১৯৭১* (১৯৮৭)
* ভূঁইয়া ইকবাল, *আনোয়ার পাশা ১৯২৮–১৯৭১* (১৯৮৮)
* বাংলা একাডেমী, *শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মারকগ্রন্থ* (১৯৭৪)
* মজহারুল ইসলাম (সম্পা), *শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মরণে* (১৯৭৩)
* মেজর রফিকুল ইসলাম, *বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ডের নেপথ্যে* (১৯৯২)
* মোঃ ইদরিছ আলী, *শহীদ সাবের ১৯৩০–১৯৭১* (১৯৮৯)
* মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, *মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী* (১৯৮৭)
* রফিকুল ইসলাম, *বীরের এ রক্ত স্রোত মাতার এ অশ্রুধারা* (১৯৭৩)
* রশীদ হায়দার, *শহীদ বুদ্ধিজীবী কোষগ্রন্থ* (১৯৮৫)
* শ্যামলী চৌধুরী, *একাত্তরের শহীদ ডাঃ আলীম চৌধুরী* (১৯৯১)
* সিদ্দিকা মাহমুদা, *মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী* (১৯৮৭)
* সুনীল কুমার গুহ, *শহীদ মোক্তার এলাহী (রংপুর)*
* সুব্রত রড়ুয়া, *শহীদুল্লাহকায়সার* (১৯৮৭)
* হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ, *আলতাফমাহমুদ* (১৯৮২)

ঙ. *দলিলপত্র ও আলোকচিত্র*

দলিলপত্র ও আলোকচিত্র শিরোনামভুক্ত বইগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তথ্য মন্ত্রণালয় প্রকাশিত ''বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র" (১৫ খন্ড দলিল, এক খন্ড আলোকচিত্র)। দলিলপত্র সম্পর্কে আমরা আগেই সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। এম, আর, আখতার মুকুল পরিচালক থাকাকালীন ২৬ লক্ষ টাকা খরচে প্রকাশিত হয় আলোকচিত্র খন্ড (ষোড়শ খন্ড)। দলিলপত্রের তুলনায় এটা নিতান্তই গুরুত্বহীন বলা চলে। এ খন্ডটি তুলনামূলকভাবে পক্ষপাত দুষ্ট, তোষণমূলক ও অপ্রাসঙ্গিক ছবিতে ভরা। যেমন, পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার, ষাটগম্বুজ মসজিদ, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট এরশাদের কয়েকটি ছবি রয়েছে। এগুলোর সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের সম্পর্ক কোথায়? তবে স্থানীয় পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের কিছু কিছু ছবি রয়েছে এতে। রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের শেষ পর্বের ছাত্র মুক্তিযোদ্ধা শহীদ নুরুন্নবীর ডায়েরী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। হাসান হেমায়েত সম্পাদিত ''শহীদ মুক্তিযোদ্ধার ডায়েরী" (১৯৯১) নামে বইটিতে রাজশাহীর মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য রয়েছে।

আলোকচিত্রের বইয়ের মধ্যে আবুল হাসনাত ও মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত ''ঢাকা ১৯৭১" (১৩৯৬) গুরুত্বপূর্ণ বই। পাকিস্তানী বাহিনী দীর্ঘ ন'মাস যে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল তার সূচনা হয়েছিল ঢাকায়। মার্চের গোড়ার দিকে বাঙালীর প্রতিবাদ, পুলিশী নির্যাতন, মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতির ছবি রয়েছে। ঢাকায় গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞের ছবি, রাজাকারদের সঙ্গে পাকিস্তানী বাহিনীর কর্তাব্যক্তিদের বৈঠক, ঢাকায় রাজাকার ট্রেনিং-এর দুর্লভ ছবি রয়েছে। ঢাকার বধ্যভূমি, পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পণ, ঢাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের প্রবেশ, বাংলাদেশে মুজিবনগর সরকার নেতৃবৃন্দ ও শেখ মুজিবের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দুর্লভ ছবি রয়েছে। অনুরূপ একটি আলোচিত গ্রন্থ প্রকাশ করেছে শিল্পকলা একাডেমী ''ঢাকা ১৯৪৮-১৯৭১" (১৯৯২)। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে বিভিন্ন আন্দোলনে ঢাকায় তোলা দুর্লভ ছবি এতে রযেছে। উভয় বইয়েই ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় বিস্তারিত ক্যাপসন রয়েছে। বিভিন্ন মহল থেকে যখন মুক্তিযুদ্ধ, পাকিস্তানী বাহিনী ও দালালদের গণহত্যা ও ধংসযজ্ঞ চাপা দেয়ার প্রয়াস হচ্ছে তখন এই এ্যালবামগুলি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে দীপ্ত ও শাণিত করবে। এধারার অন্য কিছু বইও প্রকাশিত হয়েছে (দ্রষ্টব্য, সারণী-৭)।

সারণী – ৭

* প্রকাশনা বিভাগ (ভারত সরকার), *চিত্রে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ* (১৯৭১)
* মিন্টু বসু, *মুক্তিযোদ্ধার ডায়েরী* (১৯৭১)
* মোঃ আলী নকী ও ইমাদ উদ্দিন (সম্পা), *আমাদের সংগ্রাম চলবেই*, ১ম খন্ড–১ম পর্ব (১৯৮৮)
* মোঃ আলী নকী ও ইমাদ উদ্দিন (সম্পা), *আমাদের সংগ্রাম চলবেই*, ১ম খন্ড–২য় পর্ব (১৯৮৯)
* Sipra Aditya, *Bleeding Bangladesh : A document of Valuable Photoes* (1971)
* Bangladesh Sahayak Samiti, *Bangladesh through the Lens* (a small album of Photographys) (1971)
* M. D. Husain, *International Press on Bangladesh Liberation War*, (1987)
* Fazlul Quader Quaderi (ed), *Bangladesh Genocide and World Press*, (1972),
* Publicity Division (India), *1971 War in Pictures* (1972)

চার

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায় সম্ভাবনাময় দিক নিয়ে কিছুটা আলোকপাত করা সমীচীন। এখানে এ বিষয়ে একটি রূপরেখার প্রস্তাব করা হবে। এ যাবৎ মুক্তিযুদ্ধের ওপর সবচেয়ে বড় উদ্যোগ হচ্ছে স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্প। এ প্রকল্পে সংগৃহিত দলিলের সংখ্যা সাড়ে তিন লক্ষ পৃষ্ঠা। ১৫ খন্ডে ব্যবহৃত হয়েছে মাত্র ১৫,৫০০ পৃষ্ঠা দলিল। অর্থাৎ অব্যবহৃত দলিলের সংখ্যা ৯৭%। মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ও বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনার জন্যে প্রয়োজন বড় ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ। যে উদ্যোগ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্পকে কেন্দ্র করে হতে পারে। ১৯৮৫ সালের ৬ই জানুয়ারী আন্তঃমন্ত্রণালয়ের বৈঠকে *Bangladesh Centre for Historical Research* গঠনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং তৎকালীন প্রেসিডেন্ট এরশাদ তা অনুমোদন করেন। একটি ট্রাষ্টি বোর্ড গঠন এবং ব্যয় নির্বাহের জন্যে এককালীন অনুদানের প্রস্তাবও করা হয়।[৭] যদিও প্রশাসনিক ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা সর্বোপরি তৎকালীন প্রকল্প পরিচালকের অসহযোগিতার জন্যে প্রায় চূড়ান্ত

'ইতিহাস গবেষণা সংস্থা' গঠনের সম্ভাবনা নস্যাৎ হয় এবং ১৯৮৮ সালের জুন মাসে প্রকল্পের সমাপ্তি ঘটে। বিগত সরকারের সিদ্ধান্ত অব্যাহত রেখে অথবা পরিবর্ধন বা পরিবর্তন সাপেক্ষে স্থায়ী "বাংলাদেশ ইতিহাস গবেষণা সংস্থা" প্রতিষ্ঠা জরুরী। এ সংস্থার বড় শাখাটি হওয়া উচিত "মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা সেল"।

মুক্তিযুদ্ধের স্থানীয় ইতিহাস ও জাতীয় ইতিহাস লেখার দায়িত্বে থাকবে এই সংস্থা। এটি হবে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। সরকার এর জন্যে আর্থিক অনুদান ও একটি ভবন বরাদ্দ করবে। একটি ট্রাষ্টি বোর্ডের মাধ্যমে সংস্থা পরিচালিত হবে এবং একজন সার্বক্ষনিক মহাপরিচালক থাকবেন। প্রাথমিকভাবে এ সংস্থার পাঁচটি বিভাগ থাকতে পারে এবং সংস্থা সমগ্র দেশে বিভিন্ন পর্যায়ে তিন প্রক্রিয়ায় যোগাযোগ, জ্ঞানের লেনদেন ও কার্যসম্পাদন করতে পারে। (দ্রঃ ছক – ১)

উল্লেখ্য, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ক্ষেত্রে উপাদান সংগ্রহের ধারা অব্যাহত রাখার গুরুত্ব অপরিসীম। সংগ্রহ ক্ষেত্রে স্থানীয় উপাদান সংগ্রহ বিশেষভাবে প্রাধান্য পাবে। বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে স্থানীয় বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের স্থানীয় ইতিহাস প্রণয়ন করা হলে এবং তার ভিত্তিতে জাতীয় ইতিহাস রচিত হলে সে ইতিহাস হবে পূর্ণাঙ্গ, নৈর্ব্যক্তিক ও বস্তুনিষ্ঠ। সভা সমিতি, বক্তৃতা, সেমিনার, পত্র পত্রিকায় লেখালেখি সর্বোপরি দলিল সংগ্রহ অর্ডিন্যান্স জারী করে দলিলপত্র সংগ্রহ করতে হবে। ইতিহাস রচনার পুরো ব্যাপারটি একটি বিশাল ক্যানভাস। ইতিহাস গবেষণা সংস্থা ছাড়াও স্থানীয় প্রশাসন, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, জেলা গেজেটিয়ার, মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্ট, বিভিন্ন গবেষণা সংস্থা, রাজনৈতিক দল ও সচেতন নাগরিকদের সহযোগিতা দরকার হবে। স্থানীয় পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে দুধারা অনুসরণ করা যায় ঃ (১) মুদ্রিত বা প্রকাশিত তথ্য সংগ্রহ। এবং (২) মৌখিক বিবরণী বা প্রতিবেদন। রাজনৈতিক দলসমূহের ঘোষণা, গঠনতন্ত্র, কর্মসূচী, আন্দোলন বা বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে প্রকাশিত পুস্তিকা ও প্রচারপত্র, নেতৃবৃন্দের বিভিন্ন সময়ের বক্তৃতা, বিবৃতি, দেশ বিদেশের সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর, বেতার সংবাদ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা সমাচীন। এগুলোর সাথে যুদ্ধকালে সরকার, বিভিন্ন সংগঠন, মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্যোগে প্রচারিত রণাঙ্গনের পত্রিকা, সার্কুলার, নির্দেশ ও প্রচারপত্রসহ প্রকাশিত পত্র–পত্রিকাকে বিবেচনায় আনতে হবে।[৮] রণাঙ্গনের পত্রিকাগুলোতে মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা, অপারেশনের বিবরণ, জনগণের প্রতি নির্দেশসহ স্থানীয় রণাঙ্গন ও মুক্তিযুদ্ধের প্রচুর উপাদান পাওয়া যায়। জীবিত মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক নেতা, কর্মী, সেক্টর কমান্ডার, সাব সেক্টর কমান্ডার, যুদ্ধে সংশ্লিষ্ট এবং ক্ষতিগ্রস্তদের সাক্ষাৎকার নিতে হবে। এভাবে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে স্থানীয় উপাদান বের হয়ে আসবে।

"বাংলাদেশ ইতিহাস গবেষণা সংস্থা" স্থায়ীভাবে কার্যক্রম চালানোর জন্যে জেলা, উপজেলা বা থানা পর্যায়ে নিজস্ব অবকাঠামোগত সংযোগ রক্ষা করবে। জেলা বা থানার

ছক – ১

বাংলাদেশ ইতিহাস গবেষণা সংস্থা

এবং

সংশ্লিষ্ট মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্প–এর অবকাঠামো

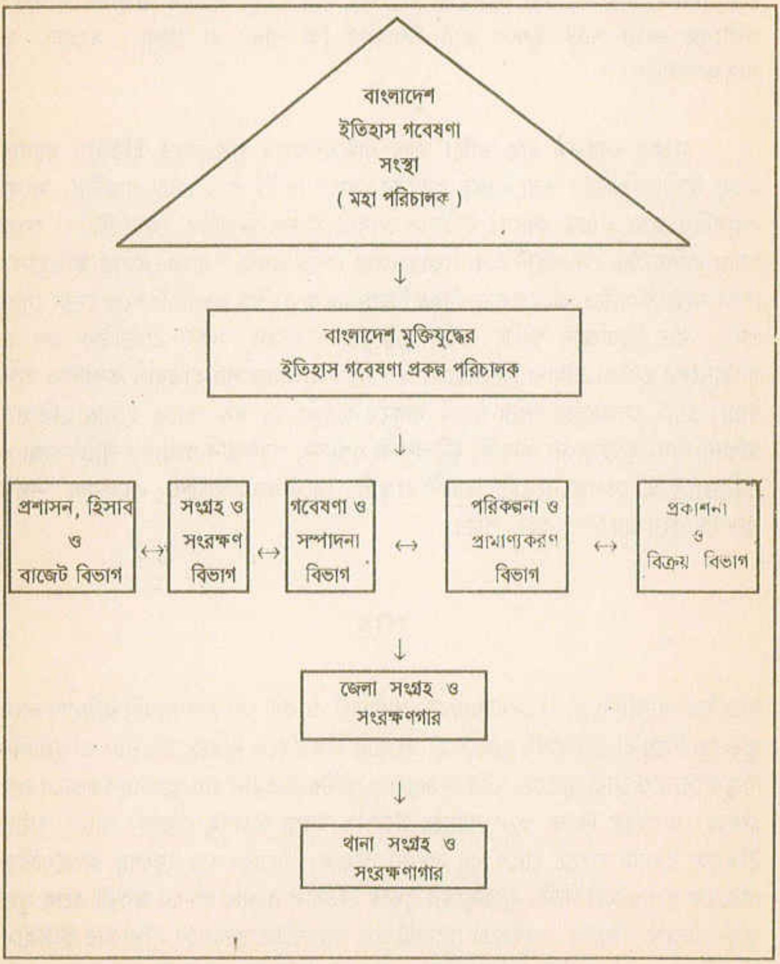

স্থানীয় ইতিহাস, দলিল–দস্তাবেজ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দলিল সংরক্ষক (Archivist)। থানা বা জেলা পর্যায়ে সেই থানা বা জেলার ভৌগোলিক বিবরণ, প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ঐতিহাসিক নিদর্শন, বিভিন্ন আন্দোলনে ঐ এলাকার ভূমিকা, স্থানীয় আর্থ–সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধে সেই এলাকার অবদান, রণাঙ্গনের অবস্থা, মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা ও জীবনী, শহীদদের তালিকা ও জীবনী, রাজাকারদের তালিকা ও কর্মকান্ড, বাঙালীর প্রতিরোধসহ যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হবে। এভাবে অঞ্চলিক উপকরণ সংগ্রহের জন্যে গড়ে তুলতে হবে উপজেলা (বা থানা) ও জেলা সংগ্রহ ও সংরক্ষণাগার।

সংগ্রহ কার্যক্রম হবে স্থায়ী। তবে প্রাথমিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার জন্যে স্থানীয় ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ পর্যায়ের মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দেয়া বাঞ্ছনীয়। সংস্থা সরাসরিও তথ্য সংগ্রহ করবে। ইতিহাস লেখার সময়ও নির্ধারিত হওয়া উচিৎ। লেখা পর্যায় এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশের চলতি প্রকল্প "বাংলাদেশের ইতিহাস" (তিন খন্ডে প্রকাশিত) গ্রন্থের ন্যায় বিষয় বিশেষজ্ঞকে সংশ্লিষ্ট অধ্যায় লিখতে দেয়া যেতে পারে। খন্ড বিভাজনে স্থানীয় পর্যায় মুক্তিযুদ্ধ, গণহত্যা, সকল রাজনৈতিক দল ও গণমানুষের ভূমিকা প্রাধান্য দিতে হবে। ২০ খন্ডে বাংলাদেশের ইতিহাস প্রকাশিত হতে পারে। ১১টি সেকটরের জন্যে বরাদ্দ থাকবে অন্ততঃ ১১ খন্ড, যাতে স্থানীয় ইতিহাস প্রাধান্য পায়। মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি, মুজিবনগর প্রশাসন, পাকিস্তান প্রত্যাগত মুক্তিযোদ্ধা ও পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙালী, প্রবাসী বাঙালী, বৈদেশিক প্রতিক্রিয়া, এ্যালবাম, নির্ঘন্ট একখন্ড করে প্রকাশিত হতে পারে।

পাঁচ

উল্লেখিত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, স্বাধীনতা পরবর্তী থেকে অদ্যাবধি বক্তিগতভাবে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যা লেখালেখি হয়েছে তা সংখ্যার দিক থেকে নিতান্ত কম নয়। প্রতিষ্ঠানিক কিছু উদ্যোগও নেয়া হয়েছে। তবে মুক্তিযুদ্ধের স্থানীয় ইতিহাস চর্চা তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে। এক্ষেত্রে বিগত ৩/৪ বছরের উদ্যোগ অবশ্য উৎসাহ ব্যঞ্জক। যদিও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে দেশে বহু সমস্যা রয়েছে। বিশেষ করে দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ ও সরকারী নীতি। মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে জরুরী হচ্ছে মুক্ত স্বাধীন চিন্তার পরিবেশ। স্বাধীনতা বিরোধী চক্র পরিবেষ্টিত প্রশাসনে সত্যিকার ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়। স্বাধীনতা বিরোধীদের ব্যাপারে সরকারী ও রাজনৈতিক দলগুলোর নীতি স্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। আরো প্রয়োজন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিকাশ ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির ঐকমত্য। যে চেতনা দীর্ঘ দিন ধরে নানাভাবে বিনাশ হয়েছে তা একদিনে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব নয়। জনগণকে '৭১ এর চেতনায় জাগ্রত না করতে পারলে

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনায় তারা অংশ নিবে না, তথ্য-দলিল সরবরাহ করবে না। তাই সরকারী ও বেসরকারী উভয় পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগরণের জন্যে উদ্যোগ নিতে হবে। সংবাদপত্র, টিভি, রেডিও, চলচ্চিত্র, পাঠ্যক্রমসহ সর্বত্র মুক্তিযুদ্ধের অনেকটা অবলুপ্ত অবস্থাকে প্রকাশ্য জগতে নিয়ে আসতে হবে।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার লক্ষ্যে যে রূপরেখা দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কে আমরা সর্বশেষ মন্তব্য করতে চাই। ১৫ খন্ড দলিল ও ১ খন্ড আলোকচিত্র প্রকাশের মাধ্যমে প্রথম বারের মতো স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস রচনার যে ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে একে কেন্দ্র করে বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস প্রণয়নের স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারলে কাজ সহজ, সাবলিল ও স্বল্প সময়ে সম্পন্ন হবে। সংস্থা ইতিহাস, সমাজ, রাজনীতি, সংস্কৃতি বিভিন্ন দিকসহ বাংলাদেশ সম্পর্কিত তথ্য উপাদান সংগ্রহ ও গবেষণার কাজ অব্যাহত রাখবে। সংস্থার কাজ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রকাশের পর গুটিয়ে ফেলা সমীচীন হবে না। বাজারের চাহিদা অনুযায়ী প্রতি পাঁচ বছর অন্তর নতুন তথ্য সংযোজন করে নতুন সংস্করণ করা যেতে পারে। ইতিহাস রচনা ছাড়াও সংস্থা বাংলাদেশের ইতিহাস, বাংলাদেশ স্টাডিজ, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গবেষণা অব্যাহত করতে পারে। পি এইচ, ডি এম ফিল গবেষকদের বৃত্তিপ্রদান, সহায়তা প্রদান, মান সম্মত মুক্তিযুদ্ধের বই প্রকাশ করতে পারে। প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় স্তরের ইতিহাস সম্পর্কিত পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নও এ সংস্থার নিকট অর্পিত হতে পারে। সর্বোপরি, মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক যাদুঘর ও সংগ্রহশালা স্থাপন এ সংস্থার তত্ত্বাবধানে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইতিহাস গবেষণা সংস্থার পাশাপাশি স্থানীয় ইতিহাস চর্চা প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

টীকা ও তথ্য নির্দেশ

১. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জী* (ঢাকা, মূলধারাঃ ১৯৯১)। বইতে ১১টি শিরোনামে মুক্তিযুদ্ধের বইগুলোকে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন- মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি, মুক্তিযুদ্ধের সার্বিক ইতিহাস রচনার প্রয়াস বা মূল্যায়ন, প্রবাসী সরকার ও প্রবাসে বাঙালীর প্রতিক্রিয়া, মুক্তিযুদ্ধে বর্হিবিশ্বের প্রতিক্রিয়া, পাকিস্তানী বা পাকিস্তানপন্থীদের দৃষ্টিতে মুক্তিযুদ্ধ, রণাঙ্গন বা সশস্ত্র সংগ্রাম, অবরুদ্ধ বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ, দলিলপত্র ও আলোকচিত্র, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশ, সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধ। ইংরেজীতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ৩৪১টি প্রবন্ধপঞ্জী নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে Joyce L. Rahman and Enayetur Rahim-Fr Bangladesh - A select Bibliography of English language, Periodical literature 1971-1986. (Dhaka : Asiatic Society of Bangladesh, 1986.) এতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রবন্ধপঞ্জী রয়েছে ১৫২-১৭৪ পৃষ্ঠায়।

২· পলাশ জুবায়ের, ''স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রণয়ন'' *দৈনিক সংবাদ* (২৪ শে মার্চ, ১৯৯১)

৩· অলোক বসু, ''মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণে দিনাজপুর'', *সচিত্র সন্ধানী,* (৯ই জুলাই, ১৯৯০)

৪· মুক্তি সংগ্রাম স্মৃতি ট্রাষ্ট, সুনামগঞ্জ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্যে দেখুন মোহাম্মদ আলী ইউনুছ সম্পাদিত *মুক্তিযুদ্ধে সুনামগঞ্জ* (সুনামগঞ্জ, ১৯৯১), পৃঃ ১২১–১২৪,

৫· মুনতাসীর মামুন ''মুক্তিযুদ্দের বই'' একুশের প্রবন্ধ '৯০ (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১০৯০) পৃঃ ৩০–৩১

৬· Kushwal Sing, "The Freedom Fighter of Bangladesh", *Illustrated Weekly of India,* (Bombay, December, 19, 1971) P. 22

৭· এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্যে দেখুন, ''বস্তাবন্দী মুক্তিযুদ্ধের দলীলপত্র কে দায়ী?'' *সাপ্তাহিক বিচিত্রা,* ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৯০। ''আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকেও স্থায়ী বাংলাদেশ ইতিহাস গবেষণা সংস্থা'' গঠনের বিস্তারিত রূপরেখা দেয়া হয়। এ সম্পর্কিত বিবরণ পাওয়া যাবে 'Minutes of the meeting held on 6.1.85 at noon in the Chamber of Minister for Planning to discuss the Project on the "History of Bangladesh War of Independence and Proposed establishment of Bangladesh Centre for Historical Research" under a Trust PP 4-5.

৮· শাহ আহমদ রেজা,''স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস রচনা সমস্যার কতিপয় দিক'', *সুন্দরম,* (ফাল্গুন ১৩৯৩ – বৈশাখ ১৩৯৪) পৃঃ ৮১।